২০

শিশু অধিকার

সোহানা শবনম

এ পর্বে সতর্কতার সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা হবে শিশু অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশের জাতীয় আইন, নীতি ও বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তে কতটা অগ্রগতি হয়েছে এবং ২০০৮ সালে শিশু অধিকারের চিত্রটা আদতে কেমন ছিল তারও মূল্যায়ন করা হবে।

এই এক বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে জাতীয় শিশুশ্রম নীতির চূড়ান্তকরণ এবং 'আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু' সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়। যদিও শিশুমৃত্যু রোধ ও শিক্ষায় শিশুদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্যের মতো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) লক্ষ্য অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে, তা সত্ত্বেও শিশু নির্যাতন, শিশুদের প্রতারণা, শিশুদের ওপর সহিংসতা এবং শিশুশ্রম প্রভৃতি ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক চিত্র ধরা পড়েছে। বিভিন্ন জরিপে শিশু অধিকার লঙ্ঘনের তথ্য মিলেছে। এক্ষেত্রে সরকারের দায়দায়িত্ব গ্রহণ, কর্মক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ, বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে, পরে তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়ার স্তর খুব একটা উন্নতি লাভ করেনি। অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে।

আইন ও নীতি প্রণয়ন

আন্তর্জাতিক আইন ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার আওতায় শিশু অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।[১] শিশুসহ সব নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা এ দেশের সংবিধানে রয়েছে এবং শিশুদের বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়ার কথা সংবিধানে বলা হয়েছে।[২] সংবিধানই রাষ্ট্রীয় নীতির[৩] মৌলিক বিধিবিধানের জোগান দেয়, যা নাগরিকদের মানবাধিকার সম্পর্কিত আইন ও জাতীয় নীতি তৈরিতে ভূমিকা রাখে।[৪] মজার ব্যাপার হলো, শিশু অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের নিয়মিত প্রতিশ্রুতি দিয়েও রাষ্ট্র তা রাখে না। রাষ্ট্রীয় নীতি এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রায়ই ব্যর্থ হয়।

আশার কথা যে, শিশু অধিকারকে জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যের অংশ হিসেবে গণ্য করে সম্প্রতি আরো দৃপ্ত ও দায়িত্বপূর্ণ নীতি প্রণয়নের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা শুরু হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলপত্রের (পিআরএসপি) কথা। পিআরএসপির বিশেষ দুটি পর্বের একটিতে রয়েছে শিশু অধিকার[৫] এবং অপরটিতে আছে একটি পলিসি ছাঁচ (মেট্রিক্স) যা বার্ষিক লক্ষ্য ও শিশু অধিকারভিত্তিক সূচকের সমন্বয়ে গঠিত।[৬] যা হোক, আজ পর্যন্ত সরকার এমন কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে পিআরএসপি লক্ষ্যমাত্রায় ইতোমধ্যে কতটা উন্নতি হয়েছে। সরকার অবশ্য তিনটি ন্যাশনাল প্ল্যান অব অ্যাকশনস্ ফর চিলড্রেন (এনপিএ) গঠন করেছে। সিআরসির ধারাবাহিকতা রক্ষায় এই এনপিএ গঠন

---

১ মানবাধিকার চুক্তির সংযোজন হিসেবে বাংলাদেশ কনভেশন অন দি রাইটস অব দ্য চাইল্ড (সিআরসি), সিআরসির দুটি ঐচ্ছিক প্রটোকল শিশু বিক্রি, শিশু পতিতাবৃত্তি ও শিশু পর্নোগ্রাফি (অপিএসসি) এবং

সশস্ত্র সংঘর্ষে শিশুদের বিনিয়োগ (ওপিএসি), পতিতাবৃত্তির জন্য নারী ও শিশু পাচার রোধে সার্ক

কনভেনশন (২০০২) সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শিশুশ্রমের ওপর আইএলও কনভেনশনে (১৯৯৯) চুক্তি সই করেছে। ২০০৭ সালে বাংলাদেশ সার্ক কমিটিতে তৃতীয় ও চতুর্থ মেয়াদি সংহতি প্রকাশ করেছে।

২ ধারা ২৮(৪) রাষ্ট্রকে অনুমতি দেয়, 'নারী অথবা শিশু অথবা নাগরিকদের যে কোনো পশ্চাৎপদ অবস্থা উন্নয়নে সহায়ক বিশেষ অনুবিধি ব্যবহারের।'

৩ সংবিধানের ৮-২৫ ধারা।

৪ সংবিধানের ৮(২) ধারা।

৫ ৪ কে চাইল্ড রাইটস ইসুজ এন্ড ৫ এফ ২ চিলড্রেন ইন ৫ এফ সাপোর্টিং স্ট্র্যাটেজি ১ : এনশিওরিং, সোসিয়্যাল ইনক্লুসন অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট, আনলকিং দি পটেনশিয়াল : ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর একসেলারেটেড পোভারটি রিডাকশন (পিআরএসপি) ২০০৫-২০০৮, বাংলাদেশ, জেনারেল ইকোনমিকস ডিভিশন, প্ল্যানিং কমিশন, গভর্নমেন্ট অব দি পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০০৫।

৬ পলিসি ম্যাট্রিক্স ১৭ : চিলড্রেন অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যান্ড রাইটস, *প্রাগুক্ত*।

করা। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে।

জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০০৮

সরকার ২০০৮ সালের জুলাই মাসে জাতীয় শিশুশ্রম বর্জন নীতি চূড়ান্ত করে।[৭] এই নীতির লক্ষ্য শিশুদের রক্ষায় এবং শিশুশ্রম নিরসনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা। তাছাড়া শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে রেহাই দিয়ে পুনর্বাসনের জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নেয়া।[৮]

বক্স ২০.১ : জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০০৮

- ২০০৬ সালের শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের বয়স নির্ধারণ।
- শিশুশ্রম নিরূপণ ও বর্জনের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে কর্মরত শিশু শ্রমিকদের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা।
- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে শিশুদের কাজের সময়সীমা ও ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ।
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজ চিহ্নিত করা এবং শর্তসাপেক্ষে শিশুদের বয়স অনুযায়ী কাজে নিয়োজিত করা, কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করা, সামর্থ্য ঠিক করা, কাজের পরিবেশ ও সময়সীমা ঠিক করা, স্বাস্থ্য রক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, শিশুদের শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন থেকে রক্ষা, প্রতারণা থেকে বাঁচানো, ভবিষ্যৎ উন্নতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, সচেতনতা ও সামাজিক প্রণোদনা, শিশু সুরক্ষা, শিশুশ্রম বর্জন, কর্ম সুযোগের ভিত্তিতে বাণিজ্য খাত সৃষ্টি, শিশু পাচার রোধ, শিশু পুনর্বাসন ও স্থানীয়ভাবে কর্ম সৃষ্টির কর্মসূচি হাতে নেয়া। সমাজে ও পরিবারে শিশুদের পুনরায় একত্রীকরণের ওপর জোর দিয়ে এ কর্মসূচি হাতে নিতে হবে এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো তা বাস্তবায়ন করবে।
- কাজের সমন্বয়ের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি শিশুশ্রম ইউনিট গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখা।
- সরকারি, বেসরকারি সংগঠন, মালিক ও শ্রমিক সংগঠন এবং শিশুশ্রম বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা।

গুরুত্বপূর্ণ হলো যে, এ নীতিতে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে শিশুশ্রম নীতি মেনে চলার জন্য মালিকপক্ষকে শর্ত বেঁধে দেয়া ও শর্তগুলো মেনে

---

৭ জাতীয় শিশুশ্রম রোধ নীতি, শ্রম ও কর্ম মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, জুলাই ২০০৮। যঃঃঢ়://ïïï.সড়ষব.মড়া.নফ/পযরষফষধনড়ঁৎচড়ষরপু.ফড়প.

৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩।

চলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে শিশু আইন যথাযথ মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা মনিটরের কার্যকরী ব্যবস্থাই অনুপস্থিত। নেই শিশুশ্রম নীতি মেনে চলার বাধ্যবাধকতা। অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে এই বাধ্যবাধকতার অনুপস্থিতি ও মনিট-রিং ব্যবস্থা না থাকায় অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে শর্তগুলো পালন করা হচ্ছে কিনা তা কীভাবে মনিটর করা হবে এ বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। এছাড়া এই নীতির অধিকাংশ শর্তই অন্যান্য নীতি ও সরকারের প্রতিশ্রুতিতে রয়েছে (উদাহরণ হিসেবে পিআরএসপি ও এনপিএর কথা বলা যায়)। বর্তমানে এই নীতি মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রমিক

শিশু অধিকার পরিস্থিতি

শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষাখাতে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ সামাজিক সূচক অর্জনে কিছুটা সাফল্য লাভ করেছে। ইউনিসেফ জানিয়েছে, বাংলাদেশ শিশু অধিকার সম্পর্কিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)[৯] অর্জনের পথে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইউনিসেফ উল্লেখ করেছে, মেয়েশিশু স্কুলে ভর্তির হার শতকরা ৯৬ ভাগ এবং ছেলেশিশুদের ক্ষেত্রে এই হার ৯৩ ভাগে উন্নীত হয়েছে, যদিও শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়ার হার এখনও অনেক বেশি।[১০] শিশু মৃত্যুহারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে; ১৯৯০ সালে

---

৯ কান্ট্রি ব্রিফ, বাংলাদেশ, ইউনিসেফ, ১৬ নভেম্বর ২০০৮ যঃঃঢ়:// ররর.হরপবভ.নধহমষধফবংয/পনম পৃ. ৫।

১০ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫।

শিশুমৃত্যুর হার ছিল ১০০ জন (প্রতি ১০০০ জনে), ২০০৬ সালে তা নেমে এসেছে ৫২ জনে।[১১]

শিশুদের ওপর সহিংস আচরণ

শিশু অধিকার পর্যবেক্ষক সংস্থা বিএসএএফের (ইঝঅঋ) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জানুয়ারি থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত শিশুপ্রতি সহিংসতা, প্রবঞ্চনা, নির্যাতন ও অবহেলার ঘটনা ঘটেছে মোট ২ হাজার ৭৫৫টি।[১২] ২০০৭ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৯৭৫টি।[১৩] প্রতিবেদনটিতে দেখা যায়, ২০০৮ সালে ১৫৫ জন শিশুকে খুন, ১১৪ জন মেয়েশিশুকে ধর্ষণ করা হয়েছে, নিখোঁজ হয়েছে ৩৮৬ জন শিশু, ৪২ জন শিশু আত্মহত্যা করেছে এবং এসিড আক্রমণের শিকার হয়েছে ১৫ জন শিশু।[১৪] নিচের ছকে শিশু সহিংসতার চিত্র তুলে ধরা হলো :

সারনি ২০.১ : শিশুদের ওপর সহিংসতার প্রতিবেদন ২০০৮ (১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত)[১৫]

সহিংসতার ধরন	মোট
খুন	১৫৫
ধর্ষণ-পরবর্তীকালে খুন	২০
ধর্ষণ	১১৪
অন্যান্য যৌন সহিংসতা	৩৮৬
অপহরণ	১১৯
পাচার	১১২
আত্মহত্যা	৪২
এসিড নিক্ষেপের শিকার	১৫
প্রতারণা, অবহেলা ও অন্যান্য সহিংস ঘটনা	১৭৫৫

১১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬।

১২ সহিংসতার প্রতিবেদনের মাসিক সঙ্কলন, জানুয়ারি ২০০৮- ১৬ ডিসেম্বর ২০০৮ (৬টি জাতীয় পত্রিকা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে), বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম ঢাকা, ১৬ ডিসেম্বর ২০০৮, যঃঃঢ়:// ককক.নংধভপযরষফ.ড়ৎম/সড়হঃয.ঢ়যঢ়

১৩ বাৎসরিক সহিংসতার প্রতিবেদন ২০০৭, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, ঢাকা, ১৬ নভেম্বর, ২০০৮; দেখুন : যঃঃঢ়:// ককক.নংধভপযরষফ.ড়ৎম/বধৎ/ঢ়যঢ়

১৪ *প্রাগুক্ত*।

১৫ *প্রাগুক্ত*।

	মোট ঘটনা	২৭৫৫

আসকের নিজস্ব প্রতিবেদনে দেখা যায়, গৃহ কাজে নিযুক্ত শিশুরাই সবচেয়ে ভয়াবহ সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। নিম্নে প্রতিবেদনে তুলে ধরা হলো নির্যাতিত শিশুদের ন্যায়বিচার পাওয়ার পথে সমস্যার বিষয়টি। এক্ষেত্রে কার্যকরী তদন্ত ও বিচার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি নির্যাতিত শিশু এবং তার পরিবারকে আরও অসহায় করে তোলে।

বক্স ২০.২ : শিশু গৃহকর্মী নির্যাতনের দণ্ড থেকে অব্যাহতি[১৬]

ঢাকার পল্লবীতে ২০০৮ সালের ১ মার্চ গৃহকর্মী নূরজাহানকে (১৫) তার গৃহকর্তা পিটিয়ে হত্যা করে। পুলিশ নিশ্চিত করে নূরজাহানের গায়ে আঘাত ও কাটার দাগ ছিল। পোস্টমর্টেম রিপোর্টেও এ ঘটনাকে ‘নরঘাতী’ বলে নিশ্চিত করা হয়। যাহোক, পুলিশ পরে আবার বিবৃতি দেয়, নিহতদের পরিবার ও ঘাতক মালিক পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে এবং নূরজাহানের পরিবারের পক্ষে বলা হয়, তার মৃত্যু হয়েছে আগের এক সড়ক দুর্ঘটনার সূত্র ধরে। পুলিশ শেষমেশ চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। নূরজাহানের মা ঘটনার প্রাথমিক অবস্থায় আসকের আইন সহায়তা ইউনিটে একটি অভিযোগ দাখিল করে। এর প্রেক্ষিতে আসক আইনি পদক্ষেপও গ্রহণ করে কিন্তু পরবর্তী সময়ে অভিযোগ প্রত্যাহার করায় এবং আসকের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করায় এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

শিশুশ্রম

বাংলাদেশে শিশুশ্রম একটি বড় ধরনের উদ্বেগের বিষয়, এখানে প্রায় ৭০ লাখ ৯০ হাজার শিশু বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত।[১৭] আর এই শিশুদের অন্তত ১০ লাখ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে।[১৮] সম্প্রতি সরকার জাহাজ ভাঙার কাজে শিশুদের নিযুক্ত করাকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।[১৯] ২০০৮ সালের এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, জাহাজ ভাঙার কাজে জড়িতদের শতকরা ২৫ ভাগই শিশু (অন্তত ৮ হাজার শিশু)। আর এই শিশু শ্রমিকদের শতকরা ১০ ভাগের বয়স ১২ বছরের নিচে।[২০] জাহাজ ভাঙার এই কাজে মৃত্যুঝুঁকি অনেক বেশি। তাছাড়া এ কাজ স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, এতে অঙ্গহানির ঝুঁকি পর্যন্ত থাকে,

১৬ আসক, তদন্ত ইউনিট

১৭ শিশুশ্রম জরিপ (২০০৩), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ীীী.নননং.মড়া.নফ

১৮ *প্রাগুক্ত।*

১৯ চাইল্ড ব্রেকিং ইয়ার্ড : বাংলাদেশের জাহাজ কারখানায় পুনর্ব্যবহারের জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণে শিশুশ্রম, ২০০৮, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটস (এফআইডিএইচ), এনজিও প্লাটফর্ম অন শিপ ব্রেকিং, পৃ. ৭।

২০ *প্রাগুক্ত।*

পরিত্যক্ত জাহাজের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানির মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[২১] ওই গবেষণা প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়, যেন সরকার ২০০৬ সালের শ্রম আইন সংশোধন করে জাহাজ ভাঙার মতো মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ১৬ বছরের নিচের কোনো শিশুকে না নেয়া যাতে নিশ্চিত করে। জাহাজ কারখানার মালিকরা এ আইন মেনে চলতে যাতে বাধ্য হন, সরকারকে সে ব্যবস্থাও নিতে হবে। সেই সাথে কারখানা পরিদর্শনের উদ্যোগ নিতে হবে। এ ব্যাপারে একটি জাহাজ ভাঙা নীতিপত্র তৈরি করতে হবে সরকারকেই।[২২]

শিশু গ্রেফতার ও আটক

২০০৮ সালে শিশু গ্রেফতার ও আটকের ঘটনা অব্যাহত ছিল। সে বছর গ্রেফতারের পাশাপাশি শিশুদের কারামুক্তির ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে গ্রেফতারের তুলনায় শিশুমুক্তির সংখ্যা ছিল অধিক। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সেভ দ্য চিলড্রেনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, ২০০৮ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবরে ৯৩৯ শিশুকে ৫৭টি কারাগারে প্রেরণ করা হয়, একই সময়ের মধ্যে মুক্তি দেয়া হয় ১ হাজার ৯৮ শিশুকে।[২৩] মুক্তি পাওয়া এই শিশুদের মধ্যে ৮২ শিশুকে গ্রেফতার করা হয়েছিল বিশেষ ক্ষমতা আইনে (জানুয়ারি থেকে মে ২০০৮-এর মধ্যে) যদিও পুলিশ সদর দফতর থেকে ২০০৬ সালের ৭ আগস্টে এক নির্দেশনা জারি করে বলা হয়। বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় শিশুদের গ্রেফতার করা যাবে না।[২৪]

সারণি ২০.২ : ২০০৮ সালে ৫৭ কারাগারে শিশু প্রেরণ ও মুক্তি

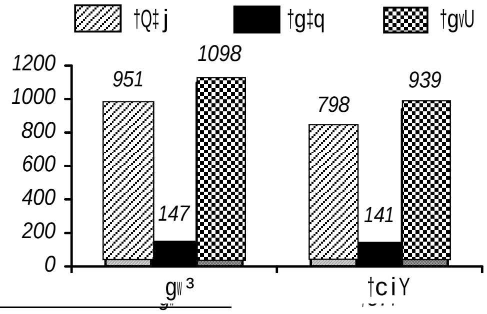

২১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫।
২২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩।
২৩ কারাগারে প্রেরিতদের তুলনায় কারামুক্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা বেশি।
২৪ প্রটেকশন ফ্যাক্ট শিট : চিলড্রেন ইন কনফ্লিক্ট উইথ দি ল, জুলাই ২০০৮, সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে, বাংলাদেশ প্রোগ্রাম।

২০০৮ সালের ২৪ এপ্রিল বাংলাদেশের ইংরেজি দৈনিক 'ডেইলি স্টার' একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'মাদক ব্যবসার দায়ে ৮ বছরের এক মেয়ের জেল'। এই প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের[২৫] ভূমিকায় উদ্বেগ প্রকাশ করে। খুলনা ও অন্যান্য বিভাগে *রাষ্ট্র বনাম খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ও অন্যান্য* মামলায় শিশু অধিকার রক্ষা ভূমিকার ব্যাপারে হাইকোর্ট গুরুত্বপূর্ণ রায় দেন। এতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শাতে বলা হয়। আদালত ব্যাখ্যা জানতে চান:[২৬]

> কোনো আইনের আওতায় ৮ বছর বয়সী একটি মেয়েকে মাদক ব্যবসার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে তাকে খুলনা জেলা কারাগারে পাঠানো হয়? কেন এই অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েটিকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না? এবং এই ক্ষতিপূরণের অর্থ কেন শিশু অধিকার আইন ভঙ্গকারী ব্যক্তিদের নিজস্ব তহবিল থেকে সরবরাহ করা হবে না?[২৭]

মামলার শুনানিকালে পুলিশ কর্তৃপক্ষ মেয়েটির বয়স ৯ বছরের ওপরে প্রমাণের চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। মেয়েটির জামিন মঞ্জুর না করায় আদালত পুলিশ কর্তৃপক্ষের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন,[২৮] মেয়েটির অভিভাবককে খোঁজে বের না করার জন্য তাদের তিরস্কার করেছেন।[২৯]

সামাজিক তদন্ত প্রতিবেদন (ঝড়পরধষ ঊহয়ঁরৎু জবঢ়ড়ৎঃ) তৈরির জন্য ঘটনাটি কেন প্রবেশন অফিসারকে জানানো হয়নি সে জন্যও আদালত সমালোচনা করেন[৩০], কারণ এই সব ক'টা উদ্যোগ নেয়ার ব্যাপারে শিশু আইনে[৩১] বলা আছে। শিশু আইনের অনুচ্ছেদ ৪৯(২) অনুযায়ী শিশুটিকে প্রাপ্ত বয়স্কদের

---

২৫ জানুয়ারি-০৮-অক্টোবর ০৮ রিলিজ অ্যান্ড এনট্রি রিপোর্ট, সঙ্কলন, দেলোয়ার হোসেন, সেভ দি চিলড্রেন ইউকে, প্রোটেকশন প্রোগ্রাম, নভেম্বর ২০০৮।

২৬ দি মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, খুলনা, চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা এবং সাব-ইন্সপেক্টর অসীম কুমার দাশ, গোয়েন্দা শাখা, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ।

২৭ রাষ্ট্র বনাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, খুলনা ও অন্যান্য, সোয়োমোটো রুল নং-৪, ২০০৮, বিচারের তারিখ ২২ জুলাই ২০০৮ (রিপোর্ট করা হয়নি)। বিচারক মো. ইমান আলীর আদালতে।

২৮ শিশু আইন ১৯৭৪-এর ধারা-৪৪, এ ধারা অনুযাযী পুলিশ অফিসার কোনো শিশুর জামিন মঞ্জুর করতে পারেন, এমনকি শিশুটিকে যদি জামিন অযোগ্য কোনো অপরাধের অভিযোগেও গ্রেফতার করা হয়।

২৯ শিশু আইন, ধারা ১৩(২) অনুযায়ী।

৩০ শিশু আইন, ধারা ৫০ অনুযায়ী।

৩১ রাষ্ট্র বনাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, খুলনা ও অন্যান্য পৃ. ২, ৩।

কারাগারেরে[৩২] বাইরে নিরাপদ হেফাজতে নিতে প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কেন ব্যর্থ হয়েছেন আদালত তাও জানতে চান।

পুলিশ কর্তৃপক্ষের দাবি মেয়েটির মা মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত, বাবার কাছেও তাকে রাখাটা নিরাপদ ছিল না। তাই বাবা-মায়ের কাছে মেয়েটির প্রত্যাবর্তন যুক্তিযুক্ত নয়। যাহোক, আদালত নির্দেশ দেন মেয়েটির হেফাজতের ব্যাপারে নিু আদালত সিদ্ধান্ত নেবে। তারপর মেয়েটিকে জামিনে খুলনার একটি এনজিওর হেফাজতে রাখা হয়।[৩৩]

বক্স ২০.৩ : শিশুদের আদালতে আটক রাখার ব্যাপারে রাষ্ট্র বনাম খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মামলায় উচ্চ আদালতের নির্দেশ

- শিশুদের (অভিযুক্ত কিংবা অন্যান্য) সর্বোচ্চ স্বার্থরক্ষা করা এই আদালতসহ অন্য সব আদালত ও রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট সব বিভাগের কর্তব্য। এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।
- কোনো শিশুকে পুলিশ গ্রেফতার করলে কিংবা অন্য কোনোভাবে পুলিশি হেফাজতে নেয়া হলে সে খবর ওই শিশুর অভিভাবকদের কোনোরকম দেরি না করে তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে হবে।
- কোনো শিশুকে আটকের পরপরই একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করতে হবে এবং তা করতে হবে তাৎক্ষণিকভাবেই, যাতে আদালতকে তিনি ওই শিশুটির ব্যাপারে যত দ্রুত সম্ভব সবকিছু জানাতে পারেন।
- শিশুদের জামিন মঞ্জুর করতে হবে। কোনোভাবেই পাশ কাটানো যায় না এমন সব ক্ষেত্রে কেবল বিনা বিচারে তাদের আটক রাখা যাবে।
- কোনো শিশুর সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে, হেফাজতখানা, যত্ন, নিরাপত্তা ও মঙ্গল, শিশুটির দৃষ্টিভঙ্গি, শিশুর পিতা-মাতা, অভিভাবক যৌথ পরিবারের সদস্যগণ এবং সমাজসেবা সংস্থাকে বিবেচনায় রাখতে হবে।
- কোনো শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থের প্রয়োজনে তাকে পিতা-মাতা থেকে আলাদা রাখা, বিশেষ নিরাপত্তা এবং সহযোগিতা দেয়া নিশ্চিত করতে হবে এবং শিশুটির জন্য অবশ্যই বিকল্প তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে।
- কোনো শিশুকে আটক কিংবা কারাগারে প্রেরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে স্বল্পতম সময়কে বেছে নিতে হবে এবং শিশুটির জেন্ডার বিবেচনায় রাখতে হবে।
- সব স্তরে শিশুদের পরিবারে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে, যাতে ওই শিশুরা সমাজের জন্য গঠনমূলক কাজ করার সুযোগ পায়।
- আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়া শিশুদের পিতামাতা/অভিভাবকরা ব্যর্থ হলে ওই শিশুদের যথাযথ বিকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্রকেই নিশ্চিত করতে হবে। যদি কোনো শিশুর পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবক তাকে বিপথে

৩২ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪।

৩৩ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬।

পরিচালনা করে এর দায়দায়িত্ব তাদের ঘাড়েই বর্তাবে। শিশুটিকে দায়ী করা চলবে না।

শিশু পাচার

একটি গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৮ সালে ১১২ জন শিশু পাচার হয়েছে।[৩৪] যদিও এ ধরনের প্রতিবেদনে সীমাবদ্ধতা রয়েছে; শিশু পাচারের সার্বিক চিত্র এতে ধরা পড়ে না, আংশিক ধারণা পাওয়া যায় মাত্র। জুন মাসে বাংলাদেশ পুলিশ অপরাধ তদন্ত বিভাগের অধীনে পাচার ঘটনাবলির তদন্তের জন্য পুলিশ পাচারবিরোধী একটি ইউনিট উদ্বোধন করে।[৩৫] যদিও এনজিওগুলো পাচারের উৎস ভূমি ও গন্তব্যের দেশগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, যাতে করে পাচার হওয়া লোকদের উদ্ধার, পুনর্বাসন ও আইনি সহযোগিতা দেয়া যায়,[৩৬] কিন্তু তাতেও এ বছর পাচার রোধে খুব একটা সাফল্য দেখা যায়নি।

সরকার ও সুশীল সমাজের ভূমিকা

শিশুদের কারাবাস, কারামুক্তি এবং মুক্তির পর তাদের সমাজে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়া পর্যবেক্ষণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ২০০৩ সালের আগস্টে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন করে; কিন্তু এটি সরকারি গেজেটে প্রথমবারের মতো প্রকাশ করা হয় ২০ জুলাই ২০০৮ তারিখে।[৩৭]

সেপ্টেম্বর ২০০৬ থেকে সম্ভবত রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জাতীয় টাস্কফোর্সের (এনটিএফ) নিয়মিত বৈঠক অনিয়মিত হয়ে পড়ে, প্রায় ১৮ মাস পর ১৭ মার্চ ২০০৮ তারিখে এনটিএফের নবম বৈঠক হয়।[৩৮] ২০০৮ সালে এনটিএফের তিন দফা বৈঠক হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে ১১তম বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় : প্রথমত, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

---

৩৪ *প্রাগুক্ত।*

৩৫ 'পুলিশ লঞ্চ এন্টি-ট্রাফিকিং ইউনিট' *নিউ এজ*, ১৮ জুন ২০০৮।

৩৬ 'কমবেটিং ট্রাফিকিং ইন উইমেন, চিলড্রেন; *টেক স্টেপস টু রিমোভ রিপাট্রিয়েশান হ্যাসেলস:* বিএনডাব্লিউএলএ আজ্ সার্ক লিডারস' *দি ডেইলি স্টার*, ২ আগস্ট ২০০৮।

৩৭ বাংলাদেশ গেজেট, রোববার ২০ জুলাই ২০০৮, ফৌজদারি কার্যবিধি, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩৮ প্রটেকশন ফ্যাক্ট শিট: চিলড্রেন ইন কনফ্লিক্ট উইথ দি ল, জুলাই ২০০৮, সেভ দি চিলড্রেন ইউকে, বাংলাদেশ প্রোগ্রাম।

এবং শিশু ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় যৌথভাবে শিশু আইন সংশোধন করে আন্তর্জাতিক মানের আইন প্রণয়নের প্রাথমিক উদ্যোগ নেবে; দ্বিতীয়ত, মন্ত্রণালয় বিভাগ এনটিএফের কর্মকাণ্ড সমন্বয় করবে।[৩৯] কিন্তু আইন সংশোধনের কোনো উদ্যোগ এখন পর্যন্ত নেয়া হয়নি।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে, নীতি ও বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের যথাযথ বাস্তবায়নের ওপর শিশু অধিকার উন্নয়ন সার্বিকভাবে নির্ভরশীল। তাই শিশুদের রক্ষায়, সহিংসতা ও প্রতারণার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য, শিশুদের সুস্থ বিকাশ ঘটিয়ে সমাজে পুনর্বাসনের জন্য, অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একটি কার্যকরী কর্মকৌশল প্রতিষ্ঠা দরকার, যা শিশুদের সব ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় বড় অন্তরায় দুর্বল শাসন প্রক্রিয়া ও মানবাধিকার লঙ্ঘন মোকাবেলায় দণ্ডাভাব। ২০০৯ সালে শিশু অধিকার রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সরকারকে আরো দায়িত্বপূর্ণ কর্মকৌশল দাঁড় করাতে হবে এবং প্রশাসনকে আরো দায়িত্বপূর্ণ ও কার্যকরী করে তুলতে হবে।

অনুবাদ : মিজান মল্লিক

---

৩৯ *প্রাগুক্ত।*